রাজনীতি-সংস্কৃতির যোগসূত্রে বঙ্গবন্ধু

সেলিনা হোসেন

কিশোর বয়স থেকেই সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনীতির যোগসূত্র গড়ে তুলেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি সাংস্কৃতিক চেতনায় ঋদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন কিশোর বয়স থেকে। অসমাপ্ত আত্মজীবনীর ১০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : 'আমি খেলাধুলাও করতাম। ফুটবল, ভলিবল ও হকি খেলতাম। খুব ভাল খেলোয়াড় ছিলাম না, তবুও স্কুলের টিমের মধ্যে ভাল অবস্থান ছিল। এই সময় আমার রাজনীতির খেয়াল তত ছিল না।
আমার আব্বা খবরের কাগজ রাখতেন। আনন্দবাজার, বসুমতী, আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী ও সওগাত। ছোটকাল থেকে আমি সকল কাগজই পড়তাম।'

তিনি স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন কিশোর বয়সে তিনি রাজনীতি নিয়ে ভাবেননি। অথচ জীবনের পরবর্তী ধাপে তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে বিশাল পরিসর গড়ে তোলেন রাজনীতির মুক্তমঞ্চে। বাঙালির স্বপ্ন সাধনায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য বাঙালি জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন যুদ্ধে জীবনজয়ী হওয়ার জন্য। তাঁর একটি অসাধারণ উক্তি আছে 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে : 'একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।'
যে ভালোবাসার শক্তি তিনি প্রবল আবেগে অর্থবহ উচ্চারণে সঞ্চারিত করেছেন, তা ব্যক্তি অনুভূতির উর্ধে দেশ ও গণমানুষের প্রতি ভালোবাসাকে সঙ্গে নিয়ে রাজনীতির দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছেন।

মানুষকে ভালোবাসার সবটুকু ধারণ করে তিনি জয়গান গেয়েছেন। এই গান রাজনীতির সঙ্গে সংস্কৃতির যোগসূত্র। সংস্কৃতি-রাজনীতির দিগবলয়ে একটি ব্যতিক্রমী শব্দ অসম্প্রদায়িকতা। বঙ্গবন্ধু কিশোর বয়স থেকেই এই শব্দ লালন করেছেন মানবিক বোধের গভীরতম সত্যে।
'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে তিনি কিশোর বয়সের আর একটি ঘটনার উল্লেখ করেন : '১৯৩৮ সালের ঘটনা। শেরে বাংলা তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী এবং সোহরাওয়ার্দী শ্রমমন্ত্রী। তাঁরা গোপালগঞ্জে আসবেন। বিরাট সভার আয়োজন করা হয়েছে। এগজিবিশন হবে ঠিক হয়েছে। বাংলার এই দুই নেতা একসাথে গোপালগঞ্জে আসবেন। মুসলমানদের মধ্যে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হল। স্কুলের ছাত্র আমরা তখন। আগেই বলেছি আমার বয়স একটু বেশি, তাই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী করার ভার পড়ল আমার উপর। আমি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী করলাম দলমত নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে। পরে দেখা গেল, হিন্দু ছাত্ররা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী থেকে সরে পড়তে লাগল। ব্যাপার কি বুঝতে পারছি না। এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, সেও ছাত্র, সে আমাকে বলল, কংগ্রেস[১০] থেকে নিষেধ করেছে আমাদের যোগদান করতে। যাতে বিরূপ সম্বর্ধনা হয় তারও চেষ্টা করা হবে। এগজিবিশনে যাতে দোকানপাট না বসে তাও বলে দেওয়া হয়েছে। তখনকার দিনে শতকরা আশিটি দোকান হিন্দুদের ছিল। আমি এ খবর শুনে আশ্চর্য হলাম। কারণ, আমার কাছে তখন হিন্দু মুসলমান বলে কোন জিনিস ছিল না। হিন্দু ছেলেদের সাথে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। একসাথে গান বাজনা, খেলাধুলা, বেড়ান- সবই চলত।'

১৯৪৯ সালের কথা বঙ্গবন্ধু লিখেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে। সে সময় তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর থানায় কৃষ্ণনগর স্কুলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। সেখানে বিখ্যাত গায়ক আব্বাসউদ্দিন, সোহরাব হোসেন ও বেদারউদ্দিন আহম্মদ খান এসেছিলেন গান গাইতে। তিনি আব্বাসউদ্দিন সম্পর্কে লিখেছেন : 'তাঁর গান ছিল বাংলার জনগণের প্রাণের গান। বাংলার মাটির সাথে ছিল তাঁর নাড়ির সম্বন্ধ। দুঃখের বিষয়, সরকারের প্রচার দপ্তরে তাঁর মত গুণী লোকের চাকরি করে জীবিকা অর্জন করতে হয়েছিল।' একজন সঙ্গীতশিল্পী সরকারি চাকরি করে জীবিকা নির্বাহ করবে কেন? এ বিষয় তিনি পছন্দ করেননি। সংস্কৃতি চর্চার মর্যাদাকে তিনি ভিন্নভাবে দেখেছেন। তিনি আরও লিখেছেন : 'পরের দিন নৌকায় আমরা রওয়ানা করলাম, আশুগঞ্জ স্টেশনে ট্রেন ধরতে। পথে পথে গান চলল। নদীতে বসে আব্বাসউদ্দিন সাহেবের ভাটিয়ালি গান তাঁর নিজের গলায় না শুনলে জীবনের একটা দিক অপূর্ণ থেকে যেত। তিনি যখন আস্তে আস্তে গাইতেছিলেন

তখন মনে হচ্ছিল, নদীর ঢেউগুলিও যেন তাঁর গান শুনছে। আমি আব্বাসউদ্দিন সাহেবের একজন ভক্ত হয়ে পড়েছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, "মুজিব, বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে। বাংলা রাষ্ট্রভাষা না হলে বাংলার কৃষ্টি, সভ্যতা সব শেষ হয়ে যাবে। আজ যে গানকে তুমি ভালবাস, এর মাধুর্য ও মর্যাদাও নষ্ট হয়ে যাবে। যা কিছু হোক, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতেই হবে।" আমি কথা দিয়েছিলাম এবং কথা রাখতে চেষ্টা করেছিলাম।'

কি সুন্দর করে তিনি বলেছেন আব্বাসউদ্দিনের গান না শুনলে জীবনের সংস্কৃতির সৌন্দর্যবোধ অপূর্ণ থাকত। কি সুন্দর করে বললেন, নদীর ঢেউও গান শুনছে। অসাধারণ অনুভূতির প্রকাশ হয়েছে এই দুই পংক্তিতে।

'ইত্তেফাক' পত্রিকায় আরও লেখা হয় : 'বন্দিদশা হইতে সদ্যমুক্ত আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান রেডিও ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপর হইতে সর্বপ্রকার বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করিয়া পর্যাপ্ত পরিমানে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারের দাবি জানাইয়াছেন। গতকাল (রবিবার) রেসকোর্সের গণসংবর্ধনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর বর্তমান সরকারের হামলার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া তিনি বলেন যে, জ্ঞান আহরণের পথে এই সরকার যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছেন তার নজির বিশ্বে বিরল। তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া তিনি বলেন যে, আমরা মির্জা গালিব, সক্রেটিস, শেক্সপিয়ার, এরিস্টটল, দান্তে, লেনিন, মাওসেতুং পড়ি জ্ঞান আহরণের জন্য আর দেউলিয়া সরকার আমাদের পাঠ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের লেখা, যিনি একজন বাঙালি কবি এবং বাংলায় কবিতা লিখিয়া যিনি বিশ্বকবি হইয়াছেন। শেখ মুজিব দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, আমরা এই ব্যবস্থা মানি না- আমরা রবীন্দ্রনাথের বই পড়িবই, আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাহিবই এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত এই দেশে গীত হইবেই। শেখ মুজিব রেডিও এবং টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীতের উপর হইতে সর্বপ্রকার বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করিয়া অবিলম্বে রেডিও ও টেলিভিশন হইতে পর্যাপ্ত পরিমানে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারের জোর দাবি জানান। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ও গতকল্যকার গণসংবর্ধনা সভার সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদ শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলা ও বাঙালির স্বার্থে অবিচল ও অবিরাম সংগ্রামের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া ঢাকার ইতিহাসে সর্বকালের সর্ববৃহৎ জনসমাবেশের উদ্দেশ্যে বলেন যে, আমরা বক্তৃতা বিবৃতিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে নানা বিশ্লেষণে বিশেষিত করার প্রয়াস পাই। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক জীবন বিশ্লেষণ করিলে যে সত্যটি সবচাইতে ভাস্বর হইয়া উঠে তাহ হইতেছে তিনি মানব দরদী –– বিশেষ করিয়া বাংলা ও বাঙালির দরদী, প্রকৃত বন্ধু। তাই, আজকের এই ঐতিহাসিক জনসমুদ্রের পক্ষ হইতে আমরা তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করিতে চাই। রেসকোর্সের জনতার মহাসমুদ্র তখন একবাক্যে বিপুল করতালির মধ্য দিয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।'
(ইত্তেফাক, সোমবার, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।)

এর একমাস পরই, ২৫ মার্চ, আইয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নেন। তিনি সামরিক শাসন জারি করে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দেন। ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। ৭ই ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিব নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করেন। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল ৬-দফা ও ১১-দফা বাস্তবায়ন।

একই বছরের ৫ ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত হয় আলোচনা সভা। আওয়ামী লীগ আয়োজিত সভায় শেষ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ' রাখেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, "একসময় এদেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে। .... একমাত্র 'বঙ্গোপসাগর' ছাড়া আর কোন কিছুর নামের সঙ্গে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। .... জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি- আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম 'পূর্ব পাকিস্তান'-এর পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'।"

রাষ্ট্রের নামের সঙ্গে সাংস্কৃতিকবোধের দৃঢ়তাও তিনি গভীর আবেগে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর রাজনীতির পুরোটা জুড়ে তিনি সংস্কৃতির চেতনাকে সংযুক্ত রেখেছেন। কোনোভাবে বিচ্ছিন্ন করেননি। রাজনীতি-সংস্কৃতির একই মাত্রায় তিনি তাঁর জীবনবোধ পূর্ণ রেখেছেন। একজন রাজনৈতিক নেতায় এ এক অসাধারণ দিক।

১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারি রমনা রেসকোর্স মাঠে ছাত্রলীগের তেইশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতায় নানা বিষয় উঠিয়ে এনেছেন। বলেছেন : 'বিশ্বে জাতি হিসাবে আত্মপরিচয় দানের জন্যই নতুনভাবে বাঙালির ইতিহাস রচনা করিতে হইবে।' বলেছেন : 'বীর বাঙালি সন্তান সূর্যসেনের নেতৃত্বে যাহারা প্রাণদান করিয়াছেন, চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক জালালাবাদ পাহাড়ে তাহাদের উদ্দেশ্যে স্মৃতির মিনার নির্মিত হইবে।'
ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতি কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলেন : 'কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামকে উপেক্ষা করিয়া বাংলা সাহিত্যের কথা চিন্তা করাও পাপ। অথচ এদেশে রবীন্দ্রনাথকে অপাংক্তেয় ও নজরুল সাহিত্যকে 'মুসলমানী' করার নামে বিকৃতি করার চেষ্টা হইয়াছে। আমাদের বাংলাভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এ ঐতিহ্যের ওপর বারবার আঘাত আসিয়াছে।'

২৫ জানুয়ারি 'দৈনিক আজাদ'-এর প্রতিবেদন ছিল এমন : '১৯৭১ সালের ২৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানে সঙ্গীত শিল্পী সমাজ শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মানে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে সংবর্ধনার আয়োজন করে। শিল্পীদের পক্ষ থেকে মানপত্র প্রদান করেন রবীন্দ্র সঙ্গীতশিল্পী আবদুল আহাদ। তিনি শেখ মুজিবকে 'বঙ্গ সংস্কৃতির অগ্রদূত' বলে নন্দিত করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন। বলেন : 'দেশের গণমুখী সংস্কৃতিকে বিকশিত করার উদ্দেশ্যে সাহিত্য-সংগীতে, কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখকে প্রতিফলিত করতে হবে। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। তাই, মাটি ও মানুষকে কেন্দ্র করে গণমানুষের সুপ্ত শক্তি ও স্বপ্ন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠবে বাংলার নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতি। আপনারা ভালোবাসা এবং শান্তির অনেক গান গেয়েছেন। আজ বস্তির নিঃস্ব সর্বহারা মানুষের জন্য গান রচনার দিন এসেছে। রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের মতো বিপ্লবী গান গাইতে হবে। মানুষের মনে প্রেরণা যোগাতে হবে। যদি এতে বাধা আসে, সেই বাধা মুক্তির জন্য ৭ কোটি বাঙালি এগিয়ে আসবে।'

আরও বলেন : 'জনগণ যখন অধিকার আদায়ের জন্যে সংগ্রাম করছিল, তখন এক শ্রেণির শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি গত ২৩ বছরে মৌলিক গণতন্ত্রের প্রশস্তি গেয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ গুছানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তারা কি আজ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন যে, তারা তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন? কোন ৪০ জন ব্যক্তি রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রদান করেছিলেন? কোন বিশেষ মহল তথাকথিত ইসলামের নামে নজরুলের গান ও কবিতার শব্দ বদলেছে? রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের অস্তিত্বটা থাকে কোথায়?'

বঙ্গবন্ধুর বই পড়ার বিষয়টিও জানা যায় 'কারাগারের রোজনামচা' বই থেকে। জেলের অবসর সময় কাটিয়েছেন আন্তর্জাতিক সাহিত্য পড়ে। ফরাসি সাহিত্যিক এমিল জোলার 'তেরেসা র‍্যেকুইন' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে ১৮৬৭ সালে। একশ বছর পরে বঙ্গবন্ধু এই বইটি পড়েন ১৯৬৬ সালে জেলখানায় বসে। লিখেছেন, 'এমিল জোলা-র লেখা 'তেরেসা রেকুইন' পড়ছিলাম। সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনটা চরিত্র - জোলা তাঁর লেখার ভিতর দিয়া। এই বইয়ের ভিতর কাটাইয়া দিলাম দুই তিন ঘন্টা সময়।'

তুরস্কের কবি নাজিম হিকমতের কথাও উল্লেখ করেছেন 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে "রাশিয়ার প্রতিনিধিদেরও আমরা দাওয়াত করেছিলাম। এখানে রুশ লেখক অ্যাসিমভের সাথে আলাপ হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এই সম্মেলনেই আমি মোলাকাত করি তুরস্কের বিখ্যাত কবি নাজিম হিকমতের সাথে। বহুদিন দেশের জেলে ছিলেন। এখন তিনি দেশত্যাগ করে রাশিয়ায় আছেন। তাঁর একমাত্র দোষ তিনি কমিউনিস্ট। দেশে তাঁর স্থান নাই, যদিও বিশ্ববিখ্যাত কবি তিনি।' এর পাশাপাশি তিন জেলখানায় বাংলা বই ও পত্রিকা না পাওয়ার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। 'কারাগারের রোজনামচা'য় আছে 'প্রাণটা আমার হাঁপাইয়া উঠছিল, সহ্য করা কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। বাংলা বই পাওয়ার উপায় নাই। অফিসার মেসের যে ছোট লাইব্রেরি আছে

তাতে কোনো বাংলা বই নাই, সমস্তই প্রায় ইংরেজি ও উর্দুতে। হেডকোয়ার্টার লাইব্রেরি থেকে মেজর গোলাম হোসেন চৌধুরী আমাকে দু' একখানা এনে দিতেন। ভদ্রলোকও খুব লেখাপড়া করতেন। কোনো বাংলা বই বোধ হয় সেখানে নাই। খবরের কাগজ পড়া নিষেধ, তাই বাংলা কাগজ পড়ার প্রশ্ন আসে না।'

এতে প্রমাণিত হয় জ্ঞানের জিজ্ঞাসায় তিনি নিজেকে পূর্ণ করেছেন রাজনীতি-সংস্কৃতির জগত ধারণ করে।

১৯৭১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা একাডেমিতে সাত দিনের অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে এসেছিলেন। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক-নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক। পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর 'ভাষা ও ভাষাবোধ' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন : 'আমি স্মরণ করছি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, বিশেষ এ কারণে যে, উনিশশ' একাত্তরের ফেব্রুয়ারিতে এই বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে তিনি এসেছিলেন। তাঁর ঠিক পেছনেই আমি বসেছিলাম, আর যখন অনুষ্ঠান চলছিল ঠিক তখনই কেউ একজন, তাঁকে ঠিক মনে নেই, তাঁরই কোনো এক সহকর্মী, বঙ্গবন্ধুর কানে কী একটা সংবাদ জরুরী ও উত্তেজিত কণ্ঠে জানালেন।
স্পষ্ট মনে পড়ে আজও, সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর মুখ ক্রুদ্ধ এবং দৃপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু পরেই জেনে যাই, জুলফিকার আলি ভুট্টোর সংসদ বর্জন করবার সিদ্ধান্তটি তাঁকে জানানো হয়। অনুষ্ঠানে গানের জন্য উপস্থিত ছিলেন এখন প্রয়াত গায়ক হুসনা বানু খানম। বঙ্গবন্ধু তাঁকে তাৎক্ষণিক ফরমাশ করেন রবীন্দ্রনাথের সেই গানটি গাইবার জন্য – 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি/ তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী'। এ তো শুধু গান নয়, বাংলা ভাষায় লেখা বলে নয়, এর অন্তর-ধাবনটি বাঙালির জন্যেও বিশেষ সেই ক্ষণটিতে-আরো প্রবল, ভাষার শরীরে প্রোথিত ইতিহাস সংস্কার নিয়েই এর উচ্চারণ। অন্যভাষায় অনুবাদ করলে বিভাষীর কাছে এ গানের অর্থটিই কেবল পরিষ্কার হয়ত হবে, কিন্তু বাঙালির জন্যে এর ব্যঞ্জনা ও অভিভাবের তিলমাত্র নয়। বঙ্গবন্ধু যে সে মুহূর্তে এই গানটিরই ফরমাশ করেন এই প্রমাণেই আমার বিশ্বাস, সেদিন এই বাংলা একাডেমির চত্বরেই বঙ্গবন্ধুর জানা হয়ে যায়, আমাদের স্বাধীনতা অতি আসন্ন। বঙ্গজননীকে এবার রণদৃপ্ত মূর্তিতে আবির্ভূত হতে হবে।"

সাংস্কৃতিক বোধের এটি একটি দিক। পাশাপাশি তাঁর মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার বিষয়টি ছিল সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক দিকের বড় পরিসর। মাতৃভাষার মর্যাদা ছাড়া মানুষ তার জাতিসত্তার শেকড় হারায়। নামমাত্র বেঁচে থাকা মর্যাদার আসন শূন্য করে রাখে। বঙ্গবন্ধু এই চেতনা ধারণ করেছিলেন তাঁর দেশবাসীর সঙ্গে। তাঁর সামনে শিল্পী আব্বাসউদ্দিন শুধু একজন গায়ক নন, তিনি সংস্কৃতির প্রতিনিধি হয়ে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার কথা বলেন। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায় যে, বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালে বাংলা একাডেমির একটি অনুষ্ঠানে তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, '১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ছিল না, বাঙালির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা সার্বিক স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন এর সাথে জড়িত ছিল।"
কত সুদূরপ্রসারী প্রজ্ঞায় তিনি বিষয়টিকে তার মধ্যে ধারণ করেছিলেন। রাজনীতির জায়গাটি তিনি সামগ্রিক চেতনায় প্রসারিত করে ধারণ করেছিলেন। এটি তাঁর জীবনদর্শনের মৌলিক জায়গা। মানুষের আবেগে-চিন্তায় দেশপ্রেমের অনুরণন ঘটিয়ে তিনি অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রামের কথা বলতেন।

১৯৭৩ সালের ৩রা মে তিনি তাঁর ডায়রিতে লিখেছিলেন : As a man, what concerns mankind concerns me. As a Bangalee, I am deeply involved in all that loneerns Bengalles. This involvement is born and nourished by love, enduring love, which gives meaning to my very being. Sheikh Mujibur Rahman, 3.5.73

"১৯২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নারায়ণগঞ্জের ছাত্রসংঘ আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তৃতায় বলেছিলেন : 'এখানকার ভূমি যেমন উর্বর, মানুষের চিত্তশক্তিও তেমনি উর্বর। যে-কোনো মহৎ কর্মকে সফল করে তোলবার মতো চিত্তশক্তি এখানকার লোকের আছে।'

পূর্ববঙ্গ নিয়ে আশাবাদী রবীন্দ্রনাথের দূরদর্শী চিন্তা ফিরে ফিরে এসেছে শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দেশের অগণিত সাধারণ মানুষ, যাঁরা শক্তি-সাহসের দেশপ্রেম দিয়ে জাতিগত সাফল্য সম্ভব করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৯ সালের ৪ নভেম্বর গুয়াহাটি থেকে সিলেটে আসেন। সিলেট ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীহট্ট মহিলা সমিতি, আনজুমানে ইসলামিয়া প্রমুখ প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রনে। নভেম্বরের ৬ তারিখে শ্রীহট্ট মহিলা সমিতি তাঁকে সংবর্ধনা দেয়। সন্ধ্যায় টাউন হলে তিনি জনসমাবেশে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় উল্লেখ করেন, 'নিম্নবর্ণের লোকদের প্রতি উচ্চবর্ণের অবজ্ঞা ও অপ্রীতিই ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ। ভারতবর্ষের পক্ষে সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন হচ্ছে একতাসূত্রে আবদ্ধ হওয়া। সূর্য পূর্বদিকেই উদিত হয়, বাংলাদেশ ভারতের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত, সমগ্র ভারতবর্ষ তাই আজ বাংলার দিকে আশা করে চেয়ে আছে। কাগজের নৌকাতে ভর করে ভবসমুদ্র পার হওয়া যায় না। মানে দরখাস্ত করে স্বরাজ মেলে না।'

কবি বলেছিলেন সূর্য পূর্বদিকে ওঠে। আর বাংলাদেশ ভারতের পূর্বদিকে। যে প্রত্যাশার কথা সেদিন তিনি বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশ তাঁর উচ্চারণে অবধারিত সত্য হয়ে ওঠে। দরখাস্ত করে স্বাধীনতা পাওয়ার কথা ভাবেননি দেশবাসী। সরাসরি যুদ্ধ করে স্বাধীনতার সূর্য উঠিয়েছেন। সূর্য রবীন্দ্রনাথের উচ্চারিত বাংলাদেশে উঠেছে শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রজ্ঞায়।

বঙ্গবন্ধু নিজের জবানীতে বলেছেন, "আমার মাথা কিনতে পারে পৃথিবীর এমন শক্তি কারো নেই। চিরদুঃখিনী বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে, শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সোনার বাংলা গড়তে গিয়ে আমাকেও হয়তো আলেন্দের ভাগ্য বরণ করতে হবে – মরতে হবে প্রতিক্রিয়াশীল আর ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে। কিন্তু আমি নতি স্বীকার করবো না।"

একই সঙ্গে তাঁর কণ্ঠে ধ্বণিত হয় কতিপয় অমর পংক্তি : –

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।"

এভাবেই তিনি বাঙালির সামগ্রিক বোধকে নিজের রাজনৈতিক চিন্তায় স্থাপন করেছেন। সেই লক্ষ্যে কর্মকান্ড পরিচালনা করেছেন। লক্ষ্য অর্জনের মাত্রাটিকে স্থিরভাবে অনঢ় রেখেছেন। এর দ্বারা বাঙালি- বাংলাদেশের বিশ্ব পরিচিতি ঘটেছে। ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদ দিবসকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে UNESCO. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে ঐতিহ্যিক প্রামানিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে UNESCO. ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তিনি জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় ভাষণ দিয়েছেন। নিজ মাতৃভাষাকে তুলে ধরেছেন বিশ্বের দরবারে। এভাবে সংস্কৃতি-রাজনীতির যোগসূত্রে বাঙালি-বাংলাদেশকে অনন্য গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সচেতন বোধে।

*****